Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 68-75
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.083

ঋগ্বেদীয় যুগে নারীস্বাতন্ত্র্য ও অধিকারপ্রসঙ্গ

ড. ব্রততী চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপিকা, টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2026; Accepted: 27.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In India, the issue of gender equality is currently being heard. In the patriarchal society women have been oppressed for a long time. Women's rights have been secured through the enactment of various laws. But the point to consider is, since when has this oppression of women been going on? Has this discrimination between men and women been there since the beginning of civilization? If we look at our oldest literature, 'Vedic literature', we get a proper idea about the matter. In the Rigveda Samhita, the oldest part of the Vedas, it is seen that although the desire for a son found a place in people's prayers during that era, a daughter was not undesirable. Furthermore, the Upanishads state that the Creator created women according to His own will. Like men, women also had the right to receive formal education through the Upanayana, otherwise they could not become seers, sages or teachers. Along with the right to education, economic rights are also enshrined in the Rigveda. The right of a daughter to her father's property was a common practice at that time, which can be understood through the mantras. Wives are presented as companions in the family, not as slaves or subordinate. In that society child marriage is not practiced and women also had the right to choose their life partner. In the present era, women are constantly fighting for all the rights in life, for establishing their own independence, which were a natural part of women's lives in the Rigvedic era. Later, during the Yajurvedic era, and the Sutra literature, the respect and status of women gradually decreased. The Rig Veda speaks of equality in the hymns. The evidence of women's independence in the Rig Vedic period reveals the liberal and modern mindset of the sages.

Keywords: Women right, Rig Veda, Upanayana, Rishika, Acharyaa, Sahadharmini

অধি পূর্বক কৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন 'অধিকার' শব্দটি বহুমাত্রিক অর্থবিশিষ্ট। শব্দটি কখনও ব্যবহৃত হয় স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব অর্থে, কখনও বা যোগ্যতা অর্থে। আভিধান আমাদের অধিকার শব্দের স্বামীত্ব, স্বত্ব, আধিপত্য, ক্ষমতা, সম্পর্ক, ব্যাকরণগত অনুবৃত্তি ইত্যাদি নানান অর্থ প্রদর্শন করালেও[১] শব্দটির উচ্চারণমাত্রে যে অর্থটি আমাদের মানসপটে হাজির হয় তা হল স্বস্বত্ত্বের প্রতিষ্ঠার কথা। কোনো বস্তু বা বিষয়ের উপর আংশিক বা পূর্ণরূপে নিজসত্ত্বের প্রতিষ্ঠাকে অধিকার বলে। একটি সমাজে বসবাসকারী সামাজিকেরা কিছু বিষয়ে অধিকার ভোগ করেন। সেগুলি কিছু সামাজিক, কিছু অর্থনৈতিক, কিছু আবার রাজনৈতিক। একজন মানুষের সুষ্ঠু সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য এই অধিকারগুলি অত্যাবশ্যক। সুস্থ ও সুন্দর সমাজের গঠনে

সামাজিকের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ যেহেতু অপেক্ষিত সেহেতু তার মানসিক, বৌদ্ধিক তথা চারিত্রিক পূর্ণবিকাশের অনুকূল পরিবেশ প্রদানার্থে কিছু অত্যাবশ্যক অধিকারদান প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যক্তিত্বের বিকাশের অপরিহার্য অধিকারসমূহ 'মৌলিক অধিকার' নামে পরিচিত। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ভারতীয় সংবিধানে ভারতবাসীর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তাদের 'মৌলিক অধিকার' গুলিকে সুরক্ষিত করা হয়। সাম্যের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার- এই সমস্ত মৌলিক অধিকার নারীপুরুষ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক বর্তমানে ভোগ করে।[২] নাগরিকদের অধিকার প্রদানে ও সেগুলি যাতে কোনওভাবে ক্ষুন্ন না হয় সেই বিষয়ে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। কিন্তু এতো গেল বর্তমানের নিয়মনীতি। আজ থেকে বহুবছর পূর্বে বৈদিকযুগে কী ছিল মানুষের অধিকার? কিভাবে সংরক্ষিত হত সেগুলি? সমাজে নারী পুরুষ কি সমান অধিকার ভোগ করত? এখন যে অধিকার আইন দ্বারা সংরক্ষিত, সেযুগে কি সেগুলি সুরক্ষিত ছিল? তৎকালীন সমাজের মানুষের অধিকারপ্রসঙ্গে এসমস্ত জিজ্ঞাসার নিরসনের জন্য বৈদিক সাহিত্যের পর্যালোচনা অপেক্ষিত।

সমাজরথের দুটি চাকা, একটি নারী আর অপরটি পুরুষ। দুটি চাকার সামান্যতম অসাম্যে রথের গতি যেমন থেমে যায় তেমনি নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ ব্যতীত সমাজের সুস্থ অগ্রগতিও অসম্ভব। ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অবদমিত নারীজাতিকে সমাজে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারী-পুরুষ সাম্যের কথা বর্তমানে ধ্বনিত হয়। মনে রাখতে হবে 'সাম্য' শব্দের অর্থ সকলের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমান সুযোগ করে দেওয়া, ব্যক্তিত্ববিকাশের পথের অন্তরায়গুলিকে দূর করা, এক লহমায় উভয়কে সমান করে দেওয়া নয়। নারীকে তার অধিকারপ্রদানের জন্য, সেগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য বর্তমানে নানান আইন প্রণিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে অধিকারের স্বরূপ কেমন ছিল? প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার যুগে নারীরা কী কী অধিকারভোগ করত? এই যে নারী-পুরুষের সাম্যের কথা বলা হল সেটা কি সেই যুগেও মান্যতা পেত? নারীদের অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত ছিল কি? ইত্যাদি নানান প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচিত হবে এই নিবন্ধে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামো এবং সেখানে নারীদের অবস্থান তথা অধিকার বিষয়ে জানার একমাত্র সহায় হল বৈদিক সাহিত্য। যেকোনো সাহিত্যই তৎকালীন সামাজের প্রতিচ্ছবি। সেই কারণেই সেই যুগের সমাজ, তাতে প্রচলিত আচার-ব্যবহার এই সমস্তকিছুরই প্রতিফলন ঘটেছে সাহিত্যের পাতায় পাতায়। বৈদিক সাহিত্য বলতে বোঝায় ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্বাত্মক চতুর্বেদ, প্রতিটি বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ এবং বেদাঙ্গগুলিকে। শিক্ষা, কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ- এই ছয়টি বেদাঙ্গ বেদের পাঠ, অনুধাবন এবং প্রয়োগাদির ক্ষেত্রে সহায়ক হওয়ায় এগুলিও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। আমরা সকলেই জানি জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর সঙ্গে ঘঞ্ প্রত্যয় জুড়ে 'বেদ' শব্দটি পাওয়া যায়। শব্দটির অর্থ 'জ্ঞান'। সুতরাং বেদ ও জ্ঞান শব্দদুটি পর্যায়বাচী। কিন্তু বেদমাত্রই জ্ঞান হলেও জ্ঞানমাত্রই বেদ নয়। বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান একথা ঠিক, কিন্তু কোন জ্ঞানকে আমরা বেদ বলব? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় বললে বলতে হয়- প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, এমন অতীন্দ্রিয় যে জ্ঞান তা আমরা লাভ করি বেদের মাধ্যমে।[৩] জ্ঞানলাভের প্রধান উপকরণ আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি স্ব স্ব গ্রাহ্যবিষয়ের সাথে সন্নিকৃষ্ট হয়ে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে। আবার প্রত্যক্ষকৃত কোন বস্তুর দ্বারা তার সাথে

সদাসম্পর্কযুক্ত কোন অপ্রত্যক্ষকৃত বিষয়ের যখন জ্ঞান হয় তখন তাকে অনুমান বলে। যথার্থ জ্ঞানলাভের এই উভয় কৌশল যেখানে ব্যর্থ হয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই বিষয় জ্ঞাত হয় বেদের মাধ্যমে। সুতরাং বেদরূপ জ্ঞান হল অতীন্দ্রিয় পরমজ্ঞান। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য বেদকে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় জানার মাধ্যমরূপে চিহ্নিত করে বলেছেন- 'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োঃ যঃ অলৌকিকমুপায়ং বেদয়তি সঃ বেদঃ।' (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ভাষ্যভূমিকা) মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মননঋদ্ধ প্রতিভার ফল এই বেদের চারটি শ্রেণী বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত- সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্। সংহিতা বা মন্ত্রভাগ চারটি- ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রতিটি সংহিতার সাথে এক বা একাধিক ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ সংযুক্ত। চতুর্বেদের মন্ত্রোচ্চারণ, তাদের অর্থানুধাবন, বিধিমতে যজ্ঞাদি নিষ্পাদন ইত্যাদি কাজের জন্য বেদের অঙ্গরূপে যে শিক্ষাদি বেদাঙ্গের রচনা হয়েছে সেগুলিও বৈদিক সাহিত্যের সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই সমগ্র বৈদিক যুগের সময়সীমা এতটাই দীর্ঘ যে সমাজে নারীদের অবস্থান এবং তাদের অধিকারপ্রসঙ্গ ধ্রুব থাকা কখনই সম্ভব নয়। সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পেয়েছে নারীস্বাধীনতা ও তাদের অধিকার। তাদের স্থান হয়েছে গৃহাভ্যন্তরে, সকলের দৃষ্টির আরালে। কিন্তু বৈদিকযুগের ঊষালগ্নে কিরকম ছিল তাদের অবস্থা তা ব্যক্ত করে বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন অংশ ঋগ্বেদের মন্ত্ররাজিতে। সময়ের সেই পরিসরেই নারীর অধিকারগুলির কথা, তাদের স্বাতন্ত্র্যের কথা আজকের আলোচ্য।

বৈদিক সমাজ ছিল সর্বাংশে পিতৃতান্ত্রিক, কাজেই ঋগ্বৈদিক সমাজও তার ব্যতিক্রম ছিলনা। পিতাই ছিলেন পরিবারের সর্বোময় কর্তা। তবে পিতৃতন্ত্রের কুপ্রভাবগুলি তখনও সমাজ ও সামাজিকদের প্রভাবিত করতে পারেনি। কিছু ব্যতিক্রমী উক্তি ছাড়া নারীদের প্রতি অশ্রদ্ধার নিদর্শন ঋগ্বেদের সংহিতাংশে দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমাজিক-ধর্মীয়-শিক্ষা ইত্যাদি জীবনের অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রগুলিতে নারীরা সম্মানজনক স্থান অধিকার করত। ভাবতে অবাক লাগে যে অধিকারগুলি ভোগ করার জন্য আজকাল নারীদের অনেকক্ষেত্রে আইনের দ্বারস্থ হতে হয়, সেগুলির অনেকাংশেই ঋগ্বৈদিক সমাজের নারীরা এমনিতেই ভোগ করত। ক্রান্তদর্শী ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্যবহারিক জীবনের মত বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের মত সমান অধিকারসম্পন্না। এক্ষেত্রে অধিকার শব্দটি যোগ্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সমতার কথা, সমগুরুত্বের কথা পৃথিবীর সামনে ঘোষনা করতে কুণ্ঠিত হননি ঋষিকবি। তাইতো ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নারীসৃষ্টির কাহিনী- "আত্মবেদমগ্রে আসীদেক এব, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ" (বৃহদারণ্যক ১/৪/৭)। সৃষ্টির আদিলগ্নে একমাত্র বিদ্যমান আত্মার কামনাবশতঃ তার জায়ারূপে নারীর সৃজন হয়। সমাজে নারী যে কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থবিশেষ নয়, তাচ্ছিল্য ও অবহেলার বস্তু নয় সেই সত্য এই মন্ত্রেই বোঝা যায়। তাকে ছাড়া পরমসত্ত্বার প্রকাশবৈচিত্র্যের পূর্ণরূপায়ণ কখনই সম্ভব নয়।

ঋগ্বৈদিক যুগে জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের বিভিন্ন স্তরে নারীজাতি যেসমস্ত অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্য ভোগ করত সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই আসা যাক ঈপ্সিতরূপে বেঁচে থাকার অধিকারের কথায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুত্রের জন্ম সর্বদা কাঙ্খিত, এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। পুত্র হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় বংশের ধারক। 'পুতাৎ ত্রায়তে ইতি পুত্রঃ'। 'পুত' নামক নরক থেকে পিতামাতাকে ত্রাণ করে বলেই সে নাকি পুত্র, সর্বোজনের অভীপ্সিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই পুত্রাকাঙ্খা আজকের যুগেও বহু কন্যাসন্তানকে পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত করে। কেড়ে নেয় তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও। কিন্তু কন্যাসন্তানের হত্যা বা কন্যাভ্রূণহত্যার কোনো নজির বেদে নেই। পুত্র কাঙ্খিত

বলে কন্যাসন্তান চক্ষুশূল, এরূপ দৃষ্টান্ত বৈদিকসাহিত্যে উপলব্ধ নয়। উপরন্তু উপনিষদের ঋষির মুখে শোনা যায় পণ্ডিত কন্যালাভের জন্য প্রার্থনা- 'অথ য ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত সর্বমায়ুরিয়াদিতি তিলৌদনং পচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতাম্' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৬/৪/১৭))।[৪] উপনিষদে আমরা শুক্রাচার্যের কন্যা 'দেবযানী' নামে এক কন্যাসন্তানের সন্ধান পাই, যার ইচ্ছামাত্রের পূরণ পিতার অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য হিসাবে দেখা যায়। সে ছিল পিতার নয়নের মণি। ঋগ্বেদে বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে বাসের প্রসঙ্গ বার বার এসেছে।[৫] কন্যার বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রের প্রার্থনা সেখানে থাকলেও তাকে অবাঞ্ছিতরূপে উপস্থাপিত করা হয়নি। সুতরাং সে যুগে কন্যাসন্তান তার বেঁচে থাকার অধিকার হারায়নি। পুত্রসন্তানের মতো পিতা তাকে যত্নসহকারে পরবর্তী জীবনের প্রতি এগিয়ে নিয়ে যেতেন।

জন্মলাভের পর বিদ্যালাভের প্রসঙ্গ আসে। শিক্ষার অধিকার যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কারণ সঠিক শিক্ষাই পারে নিজের বাকী অধিকারগুলিকে সুরক্ষিত করতে এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে। বৈদিক যুগের শিক্ষার স্থান ছিল গুরুগৃহ। পঞ্চবর্ষীয় বালকের গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষালাভের কথা আমরা জানি। এখন আলোচ্য কন্যারাও কি একইভাবে সুযোগ পেত? সেযুগে বিদ্যাগ্রহণের অধিকার নারী পুরুষ উভয়েরই একই ছিল বলে প্রতীত হয়। নারীরাও বাল্যকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দীক্ষিত হতেন, তাদেরও উপনয়ন হতো, কারণ উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত না হলে বেদপাঠের অধিকার জন্মাতো না। তার থেকেও বড় কথা বৈদিক গুরু-শিষ্য পরম্পরায় 'উপ' অর্থাৎ গুরুর সমীপে 'নয়ন' অর্থাৎ আনয়ন না করলে শিক্ষাগ্রহণ সম্ভবই ছিল না। উপনয়নাদিতে নারীর অধিকার বিষয়ে কথিত আছে-

"পুরাকল্পে কুমারীনাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে।
অধ্যাপনং তু বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।"[৬]

এই উক্তির দ্বারা জানা যার যে প্রাচীন কালে নারীদের (সম্ভবতঃ ত্রিবর্ণের) মৌঞ্জীকরণ অর্থাৎ উপনয়ন, বেদপাঠ ও সাবিত্রীপাঠের চল ছিল। প্রাচীনকাল বলতে বৈদিক সভ্যতার আদিকালকেই ধরতে হয়, যেহেতু তখনও বিভিন্ন সঙ্কীর্ণতা সমাজকে গ্রাস করেনি। অনেকে বলেন নারীর নাকি বেদপাঠে ও বেদমন্ত্র উচ্চারণে অধিকার নেই, কিন্তু বেদের ইতিহাস তো অন্য কথা বলে। ঋগ্বেদের বহু সুক্তে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকার সন্ধান পাওয়া যায়। লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, সাবিত্রী, সূর্যা, বাক্, ইন্দ্রানী, রোমশা, অদিতি, যমী, শশ্বতী প্রমুখ ঋষিকাকে মন্ত্রদ্রষ্টারূপে দেখা যায়। এঁরা ঋগ্বেদে যথাক্রমে ১/১৭৯/১-২, ৫/২৮, ৮/৯১, ১০/৩৯ ও ১০/৪০, ১০/৮০, ১০/১২৫, ১/১৪৫, ১/১২৬/৭, ৪/১৮/৫-৭, ১০/১০/১,৩,৫,৭,১১ ও ১০/১৫৮, ৮/১/৩৪ সূক্তগুলির ঋষিকা। এঁরা কখনও সমগ্র সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা, কখনও বা একটি বা দুটি বা কয়েকটি মন্ত্রের দর্শন করেছেন। অনেকে আবার এঁদের ব্যতিক্রমরূপে ব্যাখ্যা করেন, কারণ ঋগ্বেদের সংহিতাংশে পুরুষ ঋষির সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা অতি নগন্য। এই মতের দ্বারা নারীর শিক্ষার অধিকার না থাকা এবং পুরুষের সাথে সমান সুযোগ না পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। এপ্রসঙ্গে একটি বর্তমান বাস্তব অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করি। বর্তমানে কোন এক মহাবিদ্যালয়ের কোন এক বর্ষে দেখা গেল সংস্কৃত বিষয়ে পঁয়ত্রিশটি বিদ্যার্থীর মধ্যে একজনমাত্র ছাত্র, অবশিষ্ট সমস্তই ছাত্রী। প্রতিবছর কমবেশি একই অনুপাত। তাহলে আজ থেকে হাজার বছর পর এটা প্রমাণিত হয় কি যে একবিংশ শতকে পুরুষের সংস্কৃত পাঠের অধিকার ছিল না? যাদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তারা ব্যতিক্রমমাত্র? বিষয়টি শুনলেই হাস্যকর বলে মনে হয়। সেযুগে শিক্ষায় নারীদের সংখ্যালঘুত্ব এটা প্রমাণ করে না যে সেযুগে নারীদের শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ছিল না। যদি অধিকার

না থাকত তাহলে কেউ সে সুযোগ পেত না বলেই মনে হয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যথানিয়মে বিদ্যাগ্রহণ করত। গুরুপরম্পরায় দীক্ষিত না হলে এহেন প্রজ্ঞার উন্মেষ সম্ভব নয়। বৈদিক যুগে পুরুষের ক্ষেত্রে আমরা দ্বিবিধ শিষ্যের উল্লেখ পাই। প্রথমটি হল 'উপকুর্বান' অর্থাৎ যারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষালাভের অন্তে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারজীবনে প্রবেশ করত। আর যারা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে গুরুবংশ বা বিদ্যাবংশকে এগিয়ে নিয়ে যেত, তারা 'নৈষ্ঠিক' শ্রেণীর শিষ্য। নারীদের ক্ষেত্রেই উভয় পথ উপলব্ধ ছিল। শিশুকন্যারা শিক্ষারম্ভ করার পর ষোল-সতের বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর তার বিবাহের ব্যবস্থা করা হত। তাদের বলা হতো 'ব্রহ্মচারিনী'। অপরপক্ষে আজীবন বিবাহ না করে 'ব্রহ্মবাদিনী' হয়ে কিছুজন বিদ্যালাভেই মনোনিবেশ করতেন। তারা বেদের কিছু বিশেষ শাখায় পারদর্শিতাও অর্জন করতেন। যেমন- বেদের কঠশাখায় যে রমনী পারদর্শিতা লাভ করতেন তাদের বলা হত 'কঠী', বহ্বৃচ শাখা যে নারী অধ্যয়ন করতেন তাদের বলা হত 'বহ্বৃচী'। একইভাবে কাশকৃৎস্নী ('কাশকৃৎস্ন' নামক নীরস মীমাংসা গ্রন্থের উপর ব্যুৎপত্তি যে নারী অর্জন করেন) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার নারীদের কঠোর বিদ্যাভ্যাসের ও বিষয়ের প্রতি দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। যদি সেযুগে নারীদের বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়নের অধিকার না থাকত তাহলে পূর্বোক্ত শব্দগুলির উদ্ভব হতো না।

বেদাদি শাস্ত্রপাঠের পাশাপাশি ললিতকলা শিক্ষারও প্রচলন ছিল তৎকালীন সমাজে। সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি বিদ্যায় নারীপুরুষ উভয়ের অধিকার থাকলেও নারীরাই বিশেষত এই কলাবিদ্যাগুলি আয়ত্ত করতেন। তাদের বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কারিগরীবিদ্যাও দান করা হত, না হলে সে যুগে বস্ত্রবয়ন বৃত্তি ও তাতে নারীদের ভূমিকা সম্ভব হত না। পুরুষের ন্যায় নারীদেরও যুদ্ধাদি কৌশল শেখানো হত। কারণ ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে ঋষিপত্নী মুদগলিনীর যুদ্ধজয়ের আখ্যান দৃষ্ট হয় (১০/১০২)। এছাড়াও বিশপলা, বধ্রিমতী, শশীয়সী প্রভৃতি যোদ্ধার কথাও জানা যায়। যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা ব্যতীত এদের এহেন কীর্তি সম্ভব হত না। সুতরাং ঋগ্বৈদিক যুগে নারীর পূর্ণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, যা তার জীবনে চলার পথকে মসৃণ করার জন্য অত্যাবশ্যক।

যে সমস্ত কন্যারা শিক্ষান্তে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করত এখন তাদের অধিকারগুলি আলোচনা করা যাক। গৃহী হতে গেলে প্রথম কর্তব্য বিবাহ। বাল্যবিবাহ যে প্রচলিত ছিল না সেটি স্পষ্ট, কারণ তদ্ব্যতীত কন্যার ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গ আসত না। গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপনান্তে যুবতী কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করা হতো। ঋগ্বেদীয় সমাজে নারীর পতিনির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের সাতাশতম সূক্তে বলা হয়েছে- "স্বয়ং সা মিত্রং বৃণুতে জনে চিৎ"। অর্থাৎ কন্যা নিজের মিত্র বা প্রিয়তমকে বরণ করে নিত। এখানে লক্ষণীয়, মন্ত্রাংশটিতে স্বামী, প্রভু বা ভর্তা শব্দের প্রযোগ করা হয়নি। কারণ ঋষিকবি জানতেন নারীটি যাকে বরণ করছে সেই পুরুষের সে হবে সহধর্মিনী, সহচারিনী। সাংসারিক জীবনে উভয়েই যখন সমান গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী তখন কে কার ঊর্ধতন, কেই বা কার অধস্তন? নারীর জীবনে বিবাহ যে অবশ্যকরণীয় এমনও কিছু অলঙ্ঘ্য নিয়ম ছিল না সেযুগে। এমনকিছু শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় যেগুলি নারীদের চিরকৌমার্যকে দ্যোতিত করে। অমাজু বা অমাজুরা (যারা বাপের বাড়িতে বুড়ো হয়ে যায়।), কুলপা বা বৃদ্ধকুমারী বা জরৎকুমারী ইত্যাদি। অবিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে থাকারই শুধু অধিকার ছিল না পিতার সম্পত্তিতেও তার অধিকার থাকত। ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের একটি সুক্তের একটি ঋকে ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনাকালে বলা হয়েছে- "হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সাথে অবস্থিতা দুহিতা যেমন নিজ পিতৃকুল থেকেই ভাগ প্রার্থনা করে, তেমনি আমি তোমার কাছে ধন প্রার্থনা করি"[৭] পিতার সম্পত্তিতে ভাগ নারীর

অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টিকে চিহ্নিত করে। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে বিবাহের পূর্বে হোক বা পরে, কোন কারণে বিবাহ না হলেও কন্যাকে কখনও বোঝা হিসাবে দেখা হতো না। তাই অমাজু কন্যার বিবাহের জন্য পিতাকে সুযোগ্য পাত্র প্রার্থনা করতে দেখা যায়; সে যে গলগ্রহ, অবহেলিত, তার থেকে কোনপ্রকারে মুক্তির যাচনা ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হতে দেখা যায় নি।

বিবাহিতা নারীর সামাজিক অধিকারসমূহ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বৈদিক সমাজব্যবস্থা ছিল পরিবারকেন্দ্রিক। পুরুষ সেই পরিবারের গৃহকর্তা হলেও নারীর স্বাতন্ত্র্য কোথাও ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। বৈদিক সভ্যতার শেষের দিকে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নারীস্বাতন্ত্র্য খর্বিত হলেও সভ্যতার প্রথমদিকে ঋগ্বেদের সময়ে তেমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত 'বিবাহ সুক্ত'তে (১০/৮৫) বিবাহের যে বহুবিধ বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে একান্নবর্তী পরিবারের চিত্রটি ফুটে ওঠে। সেই পরিবারের নববিবাহিতা বধূ ছিলেন পুরুষের 'সহধর্মিনী'। সংসারধর্ম পালনে উভয়ে একে অপরের সহায়ক। উভয়ের সমান দায়িত্বে, সমপ্রচেষ্টায়, একাত্মতায় সুখী হত গৃহকোণ। সংসারে স্ত্রী যে সর্বোময় কর্ত্রীরূপে বিরাজ করত তার প্রমাণ আমরা নববধূকে প্রদত্ত আশির্বাদবাণীর মধ্যেই খুঁজে পায়। বলা হয়েছে-

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।। (১০/৮৫/৪৬)

অর্থাৎ তুমি (নববধূ) শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রুকে বশীভূত কর, ননদ ও দেবরদের প্রতি সম্রাজ্ঞী হও। পরিবারের সকলের প্রতি স্নেহ ও সুসম্পর্ক ব্যতীত এই প্রভূত্ব কখনই সম্ভব নয়। এই আশীর্বচন সম্পর্কে সুকুমারীদেবী বলেছেন- "বধূটির বাস্তবজীবনে সম্রাজ্ঞীত্ব দুর্লভ ছিল বলেই এ আশীর্বাদ।"[৮] উনি পরবর্তী যজুর্বেদ, অথর্ববেদ প্রভৃতির কিছু উক্তিকে ভিত্তি করে এমন মনোভাব প্রকাশ করেছেন, যেগুলি নারীর সম্রাজ্ঞীত্বের বিরোধী। এবিষয়ে বলা যেতে পারে যে ঋগ্বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে বিভিন্ন অজানা কারণে নারীর মর্যাদা খর্ব হতে থাকে, তাই সেসময়ের সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত ঋক্-এ যে আশীর্বাদ ধ্বনিত হয়েছে, তা সেসময়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকেই তুলে ধরেছে বলে মনে হয়।

শুধুমাত্র সংসারধর্মে স্ত্রী যে স্বামীর সহধর্মিনী হয়ে সমমর্যাদা ভোগ করতেন তাই নয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও স্ত্রীর ছিল সমান অধিকার। বৈদিক যুগে ধর্মাচরণ বলতে যাগ-যজ্ঞাদিকেই বোঝায়। সেই যজ্ঞ হত সর্বদা সস্ত্রীক। অপত্নীক ব্যক্তির যজ্ঞের অধিকার ছিল না। অনেকে বলেন যে পাশে বসে থাকা ছাড়া যজমানপত্নীর যজ্ঞে তেমন কোন ভূমিকা থাকত না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। প্রত্যেক প্রধান যাগে 'পত্নীসংযাজ' নামে একটি যাগ অনুষ্ঠিত হতো। সেখানে যজমানপত্নীকে অংশগ্রহণ করে কিছু বৈদিক মন্ত্র পাঠ করতে হত। ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে স্বামী-স্ত্রীর একসাথে যজ্ঞসম্পাদনের উল্লেখ আছে। যেমন, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৩ তম সূক্তে যজ্ঞের 'হোতা' রূপে স্বামী-স্ত্রীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে- "হে উগ্র ইন্দ্র! মর্ত্য হোতা, স্তোত্রাভিলাষী দেবতাগণকে স্তব করে স্ত্রীপুরুষে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করছেন।"[৯] সুতরাং পুরুষের ন্যায় নারীরও হোতা হওয়ার অধিকার ছিল। নারী যে যজ্ঞের অধিকারিনী সে বিষয়ে তার নামই প্রমাণ। জায়ারূপী নারীর অন্য নাম 'পত্নী'। 'পত্যুর্নো যজ্ঞ সংযোগে' এই পানিণীয় নিয়ম অনুযায়ী পতির সাথে মিলিত হয়ে যিনি যজ্ঞ করেন তিনিই পত্নী পদবাচ্য। সুতরাং পত্নী নামেই ধর্মাচরণে নারীর সম অংশীদারিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রীর এই যজ্ঞসম্পাদনা, মন্ত্রোচ্চারণ ইত্যাদি আর একটি সামাজিক অধিকারের দিককে চিহ্নিত করে। সেটি হল নারীর সংস্কারের ব্যবস্থা। পুরুষের ন্যায় নারীদের একাধিক সংস্কারের বিধান নিশ্চয় ছিল। নারীরও

উপনয়ন, সমাবর্তন ইত্যাদি সংস্কারগুলি হতো। গুরুর সান্নিধ্য ব্যতীত মন্ত্রোচ্চারণ পদ্ধতির জ্ঞান, যজ্ঞীয় বিধান জানা কখনই সম্ভব নয়। পুরুষের মতো নারীরাও যথাবিধি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করত।

বিবাহের প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন সমাজে বহুবিবাহের প্রচলনের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে যায়। পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ বহুশ্রুত একটি বিষয়। সমস্ত যুগের তার অস্তিত্বের ছাপ পাওয়া যায়। বর্তমানে সরকারের দ্বারা আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রথা আপন স্বরূপে অবস্থান করত। কিন্তু প্রসঙ্গটি যদি নারীর ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয় তবে বিষয়টি অন্য মাত্রা পায়। মহাভারতে আমরা এক নারীর একাধিক স্বামীর দৃষ্টান্ত পায়, কিন্ত তার বহুপূর্বে ঋগ্বেদের পাতায় আমরা সূর্যাকে পাই, যিনি অশ্বিদ্বয়কে বিবাহ করেছিলেন (৯/১১৯/৫)। অশ্বিদ্বয়ের সাথে সূর্যার একসাথে থাকার উল্লেখও পাওয়া যায় (৮/২৯/৮)। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহের নজিরও পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। দশম মণ্ডলের আঠারতম সূক্তে বিধবা রমণীকে মৃত স্বামীর পাশ থেকে উঠে এসে সংসারে ফিরে গিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছেন (১০/১৮/৮)। এই উক্তি সেযুগে সহমরণ প্রথার অবিদ্যমানতার পরিচায়ক। সম্ভবতঃ বিধবা নারীর দেবরের সাথে তার পুনর্বিবাহের প্রচলন ছিল সেই যুগে। সুতরাং বেঁচে থাকার অধিকার নারীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়নি সেযুগে।

যে সমস্ত নারী বিবাহ না করে বিদ্যাচর্চার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন তাদের সমাজে স্বতন্ত্র স্থান ছিল সমাজে। নারীর শুধু শিক্ষাগ্রহণেরই অধিকার ছিল তাই নয়, শিক্ষাদানের ভারও ছিল তার উপর। পরবর্তীতে সংস্কৃত ব্যাকরণে 'উপাধ্যায়া', 'আচার্যা' ইত্যাদি শব্দের উপস্থিতি নারীর স্বয়ং অধ্যাপিকা হবার প্রমাণ। আচার্যের স্ত্রীকে বলা হত আচার্যানী, আর স্বয়ং অধ্যাপিকা 'আচার্যা', 'উপাধ্যায়া' ইত্যাদি শব্দবোধ্য। বৈদিকযুগের সুশিক্ষিতা নারী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মাধ্যমে নিজের উৎকৃষ্ট জ্ঞানচর্চার কাহিনীকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে যে নির্যাস পাওয়া যায় তা হল ঋগ্বেদের যুগে সমাজে নারীরা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার ভোগ করতেন। পরিবারে, সমাজে, ধর্মাচরণে, শিক্ষালাভে কোথাও তাদের বঞ্চিত করা হত না। পরবর্তীতে যজুর্বেদের কালে এবং ক্রমে সূত্রসাহিত্যের সময় নারীর সম্মান ও অবস্থান ক্রমশ কমতে থাকে, সে ক্রমশ সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়, তাকে অবগুণ্ঠনে সকলের আড়ালে রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু সামাজিক এই অবক্ষয় কখনই ঈপ্সিত ছিল না। যেখানে ঋগ্বেদে ঋষিকণ্ঠে শোনা যায় সমত্বের বাণী, সেখানে নারীর সাথে অসম ব্যবহার কখনই কাম্য নয়। ঋগ্বৈদিক যুগে নারীদের স্বাতন্ত্র্যের যে সাক্ষ্য মেলে, তাতে ঋষিগণের উদার ও আধুনিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র:

১. মিত্র, সুবলচন্দ্র (১৯৪৩)। আদর্শ বাংলা অভিধান (তৃতীয় সংকলন)। নিউ বেঙ্গল প্রেস, পৃ. ৬২।
২. ভারতের সংবিধান (৪৪তম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৮। [ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১ বিলুপ্ত এবং অনুচ্ছেদ ৩০০এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে]।
৩. প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্বেদস্য বেদতা।। - যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

- বসু, যোগীরাজ (২০২৪)। বেদের পরিচয়: বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস। সংস্কৃত বুক ডিপো। পৃ. ১।

৪. সেন, অতুলচন্দ্র (২০২১)। উপনিষদ্: অখণ্ড সংস্করণ। হরফ প্রকাশনী, দ্রষ্টব্য-বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৬/৪/১৭)।

৫. দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনুবাদক)। (২০১৫)। ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। হরফ প্রকাশনী, দ্রষ্টব্য মন্ত্র- ঋগ্বেদ ১/১১৭/৭, ১০/৩৯/৩, ১০/৪০/৫।

৬. গোপ, যুধিষ্ঠির (২০১৯)। বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস। সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃ. ১০০।

৭. দ্রষ্টব্য ঋগ্বেদ সংহিতা ২/১৭/৭।

৮. ভট্টাচার্য, সুকুমারী (১৩৯৪)। প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩২।

৯. প্র মন্দযুর্মনাং গূর্ত হোতা ভরতে মর্ষো মিথুনা যজত্রঃ। (১/১৭৩/২)- দত্ত, রমেশচন্দ্র.(অনুবাদক)। (২০১৫) । ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড)। হরফ প্রকাশনী।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম খণ্ড)। রমেশচন্দ্র দত্ত (অনু), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।

২. ঋগ্বেদ-সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড)। রমেশচন্দ্র দত্ত (অনু), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল। ভারতীয় বিদুষী। পত্রলেখা, কলকাতা, ২০১৮।

৪. গোপ, যুধিষ্ঠির। বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৯।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি। বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৩।

৬. বসু, যোগীরাজ। বেদের পরিচয়: বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০২৪।

৭. ভট্টাচার্য, সুকুমারী। প্রাচীন ভারতঃ সমাজ ও সাহিত্য। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৪।

৮. মিত্র, সুবলচন্দ্র। আদর্শ বাংলা অভিধান (তৃতীয় সংকলন)। নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, ১৯৪৩।

৯. সেন, অতুলচন্দ্র। উপনিষদ্: অখণ্ড সংস্করণ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯।